বিবেকমনন

দাও আর ফিরে নাহি চাও

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

ছোটবেলায় দেখতাম ভিখারিদের একটা ছোট সরায় করে চাল দেওয়া হত। বাড়ির শিশুদের হাত দিয়েই ভিক্ষা দেওয়ানোর রেওয়াজ ছিল। ভিক্ষা পেয়ে তারা অনেক আশীর্বাদ করত। এই দানের ফলে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য কত সুখ-সমৃদ্ধির আশ্বাস যে দিত তারা! কিন্তু একটি বৃদ্ধা ভিখারিনিকে ভিক্ষা দিলেই সে একগাল হেসে বাঙাল ভাষায় বলে উঠত—'দিলে ভালা' অর্থাৎ দেওয়া ভাল। দান তার নিজস্ব মূল্যেই ভাল। দান করলে কোন কোন স্বর্গলোক প্রাপ্তি হবে তার তালিকা জানার প্রয়োজন নেই। দান একটি মানবধর্ম, আর ধর্মাচরণ মানুষকে তার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়। তাই দান শুভ, দান মহৎ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, ধর্মের তিনটি বিভাগ। তার মধ্যে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান একটি ধর্মবিভাগ। জনশ্রুতবংশীয় পৌত্রায়ণ বহু দান করতেন। তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে বহু মানুষকে আহার করাতেন, অনেক পান্থশালা নির্মাণ করিয়েছিলেন। দাতা হিসেবে তিনি ছিলেন সুপরিচিত। এক রাতে উত্তাপ নিবারণের জন্য তিনি তাঁর প্রাসাদের উন্মুক্ত ছাদে অবস্থান করছেন, এইসময়ে দুটি পাখির কথোপকথন শুনতে পেলেন। আকাশপথে উড়ে যাচ্ছে দুটি হাঁস। একটি অপরটিকে বলছে, ''ওহে ভল্লাক্ষ, জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের দানের প্রভা স্বর্গলোক পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আছে। তুমি সাবধানে যাও। সেই প্রভা যেন তোমাকে দগ্ধ করে না ফেলে।''

দ্বিতীয় হাঁসটি বলল, ''তুমি দেখি এই মহাত্মা সম্বন্ধে এমন কথা বলছ যা রৈক্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য।''

''এই রৈক্ব কে?''

''যেখানে যত পুণ্য প্রাণীরা অর্জন করে সেসব পুণ্যফলই রৈক্কের আছে। তাই কোনও ব্যক্তির কোনও পুণ্যফলের কথা শুনলেই আমি তাকে রৈক্কের মতো বলি।''

হাঁস দুটি উড়ে চলে গেল। পরদিন থেকে জানশ্রুতি রৈক্কের অনুসন্ধান শুরু করলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ইনি নিশ্চয়ই একজন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এই ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিকে তাঁর দূত আবিষ্কার করলেন একটি অদ্ভুত পরিস্থিতিতে। ঋষি একটি গোরুর গাড়ির নিচে বসে নিজের গায়ের খোসপাঁচড়া কণ্ডূয়ন করছেন। বিনম্র জানশ্রুতি বহু উপহার, নিজের কন্যা এবং যেসব গ্রামে রৈক্ব বাস করেছেন সেসব গ্রাম রৈক্বকে দান করে তাঁর কাছে বিদ্যাপ্রার্থনা করলেন। ধনদাতা বিদ্যাগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। রৈক্ব সন্তুষ্ট হয়ে জানশ্রুতিকে সম্বর্গবিদ্যা প্রদান করলেন (ছান্দোগ্য, ৪।১—৪।৩।৪)।

উপনিষদ বলছেন, দান এমনই এক ধর্মাচরণ যা মানুষকে ব্রহ্মবিদ্যালাভেরও উপযুক্ত করে।

গীতায় বলা হয়েছে, সন্ন্যাসী কাম্যকর্ম ত্যাগ করলেও যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা—এই তিনটি কর্ম কখনও ত্যাগ করবেন না। কারণ এই তিন কর্ম মনীষীদের চিত্তশুদ্ধি ঘটায় (১৮।২,৩,৫)। দান আবার তিন রকমের—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। অশ্রদ্ধায়, অবজ্ঞায়, অনুপযুক্ত মানুষকে অসময়ে, অশুচি স্থানে যে-দান করা হয় তাকে তামসিক দান বলে। প্রত্যুপকার পাওয়ার আশায়, নামযশ বা স্বর্গাদি কাম্যফল লাভের জন্য যথেষ্ট ক্লেশের সঙ্গে যে-দান তা হল রাজসিক দান। আর 'দান করা কর্তব্য' এই বুদ্ধিতে, প্রত্যুপকারের কোনও আশা না রেখে অনুপকারী ব্যক্তিকেও উপযুক্ত স্থানে-কালে যে-দান করা হয় তাকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়। এই তিনটি দানের মধ্যে সাত্ত্বিক দানই সর্বশ্রেষ্ঠ (গীতা, ১৭। ২০-২২)।

যুগাচার্য বিবেকানন্দ শাস্ত্রের মূলভাবকে অবিকৃত রেখে জনসাধারণের জন্য, শাস্ত্রের আধুনিকতম ভাষ্য রচনা করেছেন। দানব্রতের বিবেকভাষ্য হল : ''দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।" এ-দানের অর্থ অনেক ব্যাপক। পরোপকার, সেবা, লোককল্যাণমূলক কর্ম, এমনকী আত্মদান—সবই এই দানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রতিদানের কোনও আশা থাকলে চলবে না। কোনও মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে গিয়ে যদি প্রতিমুহূর্তে আদান-প্রদান, লেনদেনের হিসাব নিকাশ চলতে থাকে, তাহলে সেই সম্পর্ক কখনও স্বতঃস্ফূর্ত হয় না। সুন্দর সম্পর্ক সেখানেই গড়ে ওঠে যেখানে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা থাকে। ভালবাসার প্রথম শর্তই ত্যাগ। ত্যাগ যখন প্রেম থেকে উৎসারিত হয়, তখনই তা সার্থক ও পরিপূর্ণ। গীতার উপরিউক্ত সাত্ত্বিক বা শ্রেষ্ঠ দানের ব্যাখ্যাকে স্বামীজী সম্প্রসারিত করেছেন। শুধু কর্তব্যবুদ্ধি নয়, দান হবে প্রেমপূর্ণ। দানে থাকবে আন্তরিকতা, ভালবাসা। প্রকৃত ভালবাসা প্রতিদান চায় না। তাই হৃদয়বান ব্যক্তি প্রত্যাশা রেখে দান করেন না।

প্রত্যুপকারের আশা রেখে দান এবং ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ভিখারি স্বাধীন নয়, পরনির্ভর। সে তার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, তার জীবনধারণের জন্য পরপ্রত্যাশী। সে কৃপার পাত্র, দয়ার পাত্র। মনুষ্যত্বের এই অবমাননা তাকে কখনও সুখী করতে পারে না। যে-দাতা হিসেব করে দান করে, যে দান করতে গিয়ে ভাবে যে এর ফলে গ্রহীতা কতটা কৃতজ্ঞ থাকবে, অথবা প্রতিদানে তাকে কোন কোন কাজে সুবিধা করে দেবে, সেই দাতার সঙ্গে একজন ভিক্ষুকের কোনও তফাত নেই। অনেকসময় কোনও ব্যক্তিকে সামান্য সাহায্য করেই আমরা মনে করি, তাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধে ফেললাম। তার উচিত আজীবন সেই সাহায্যের কথা মনে রেখে আমার কাছে নতশির হয়ে থাকা। এ-ধরনের মানসিকতা ক্রমশ আমাদের অহংকৃত করে। যত বেশি দান করি, তত বেশি অপরের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, নামযশের লালসা আমাদের মনকে অস্থির করে রাখে। ফলে এত বড় পবিত্র দানব্রত পালন করেও সর্বদা প্রসন্ন থাকতে পারি না। আমাদের প্রসন্নতা বা বিষণ্ণতা নির্ভর করে গ্রহীতার প্রশংসা বা ঔদাসীন্যের ওপর, তার প্রত্যুপকার বা উপেক্ষার ওপর। এই মনোভাবের সঙ্গে ভিক্ষুকের মানসিকতার কোনও পার্থক্য নেই। তাই স্বামীজী বলছেন, ''ভিক্ষুকের কবে বল সুখ, কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল/ দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

দানের পরিণত অবস্থা হল আত্মোৎসর্গ। আত্মদানের মহিমা সর্বজনীন, সর্বকালিক। দেশ-কাল ছাপিয়ে মানুষ আত্মত্যাগী বীরের মহিমা কীর্তন করেছে, তাকে দেবতার মতো পূজা করেছে। পৌরাণিক ঋষি দধীচির পরার্থে দেহদানের গল্পগাথা

যুগে যুগে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে আসছে মানুষ। যোদ্ধা ফিলিপ সিডনির কাহিনিও বহু পরিচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে মুমূর্ষু সিডনির কাছে সামান্য একটু পানীয় জল ছিল। অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে ওই জলবিন্দুটুকু গলায় ঢালতে যাচ্ছেন, তখনই একটি কাতরোক্তি শুনতে পান। পাশেই আর এক আহত সৈনিক জল চাইছে। সিডনি তাঁর ক্ষতবিক্ষত শরীরকে টেনে হিঁচড়ে সেই সৈনিকের কাছে গেলেন। সামান্য জলটুকু বন্ধুর মুখে ঢেলে দিয়ে নিজে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। পাশ্চাত্য লেখক মনে করেছেন, এ-আত্মোৎসর্গকে মহত্তম শিল্পের সঙ্গে তুলনা করা যায় (দ্রঃ William Lillie, An Introduction to Ethics)। ভারতবর্ষ বলবে, এই আত্মদানকে কেবল ঈশ্বরত্বের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যাঁরা বিশ্বধাতার যজ্ঞশালায় প্রজ্বলিত আত্মদানের বহ্নিতে জীবন আহুতি দিয়ে মৃত্যুকে ছাপিয়ে গেছেন, তাঁরা ঈশ্বরকে স্পর্শ করেছেন, নিজেদের স্বরূপকে স্পর্শ করেছেন। স্বরূপত আমরা পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণ দান করা হলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। একথা স্মরণে রেখেই স্বামীজী বলতে চেয়েছেন, দান করলে কিছুই হারানোর ভয় নেই, কারণ আমরা যে অনন্ত! ''অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান/ দাও দাও যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।''

আমরা সচ্চিদানন্দস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ। আমাদের প্রেমসমুদ্র থেকে অঞ্জলি অঞ্জলি প্রেম যতজনের মধ্যেই ছড়িয়ে দিই না কেন, তাতে আমাদের স্বরূপের কোনও হ্রাসবৃদ্ধি হবে না, বরং আমরা আমাদের আনন্দময় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকব। কিন্তু যখনই প্রতিদান চাইব তখনই স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব। আমি যে অনন্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, এই ভাবটি মন থেকে মুছে গেলেই আমি ক্ষুদ্র, বিন্দু হয়ে যাব।

প্রত্যাশাশূন্য দান আমাদের স্বরূপে পৌঁছনোর একটি উপায়। অনন্ত প্রেমসমুদ্রকে হৃদয়ে উপলব্ধি করার অন্যতম সাধন হল ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য দান। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, ওঁ তৎ সৎ—এই তিনটি হল ব্রহ্মের নির্দেশ বা নাম। ওঁকার উচ্চারণ করে যজ্ঞ-দান-তপঃ ক্রিয়া আরম্ভ করা হয়। 'তৎ' এই ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করে মোক্ষকামী সাধক কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা না রেখে যজ্ঞ-দান-তপঃ এবং দানক্রিয়া অনুষ্ঠান করে থাকেন। আর এই তিনকর্মে যে-দৃঢ়নিষ্ঠা তাকেই 'সৎ' বলা চলে। শুধু তাই নয়, ফলবুদ্ধিত্যাগ করে ব্রহ্মের প্রীতির জন্য যে-যজ্ঞদানতপঃরূপ কর্তব্যকর্ম তাই হল ঈশ্বরার্থে কর্ম। এই কর্মকেও ব্রহ্মস্বরূপ 'সৎ' বলা হয়েছে (গীতা, ১৭।২৩-২৭)। অর্থাৎ যজ্ঞ-দান-তপস্যা ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে ঈশ্বরার্থে সমর্পিত হলে তা সাধককে ব্রহ্মস্বরূপতার দিকে নিয়ে যায়।

ঈশ্বরবুদ্ধিতে নিষ্কামভাবে কৃত এই পুণ্যব্রতেরই আর-এক নাম রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিভাষায় 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'। স্বামীজী বলছেন, ''জগতে সর্বদা দাতার আসন গ্রহণ করো, ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, এতটুকু যা তোমার দেওয়ার আছে দিয়ে দাও। কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেও না।'' ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে এই মহৎ দান একটি স্বতন্ত্র সাধনপ্রণালী। স্বামীজী স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন, ''যিনি শিবের সেবা করতে ইচ্ছা করেন, তাঁকে তাঁর সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করতে হবে—জগতের জীবগণের সেবা আগে করতে হবে। শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে, যাঁরা ভগবানের দাসগণের সেবা করেন, তাঁরাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ দাস।''

স্বামীজী কিন্তু 'সাহায্য' শব্দের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন 'উপাসনা' শব্দের উপর। দানের অন্তর্নিহিত ভাব হবে এমন যে আমি ঈশ্বরের উপাসনা করছি। তিনি বলছেন, ''সাহায্য তুমি করতে পার না। এরূপ বলা ঈশ্বরের নিন্দা করা, তাঁর কৃপাতেই তোমার অস্তিত্ব—তুমি কি মনে কর, তুমি তাঁকে সাহায্য করছ? তুমি তাঁর উপাসনা

করছ।" ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য দান আর কিছুই নয়—তা ঈশ্বরের উপাসনা, শিববুদ্ধিতে জীবের উপাসনা।

স্বামী বিবেকানন্দের এই নবযুগধর্মকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন যে-বিবেকানন্দ-রেজিমেন্ট—তাঁদের জীবনগুলিই ছিল 'দাও আর ফিরে নাহি চাও' মন্ত্রের সাকাররূপ। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্লেগ ভয়ানক মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওইসময় বাগবাজার পল্লির বস্তিবাসীরা দেখতে পেতেন এক শুভ্রবসনা শ্বেতাঙ্গিনী করুণাময়ী মূর্তিতে তাঁদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আন্তরিক সেবায় তাঁদের জীবনে নতুন আশার সঞ্চার করছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর (আর জি কর) লিখেছেন, ''একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগি-পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধূলি-ধূসর কাষ্ঠাসনে একজন য়ূরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা; একটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগমন-প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতেছেন। সেইদিন প্রাতে বাগবাজারে কোনও বস্তীতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। রোগীর ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন।... অপরাহ্ণে পুনরায় রোগী দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, সেই অস্বাস্থ্যকর পল্লীতে, সেই আর্দ্র-জীর্ণ কুটীরে নিবেদিতা রোগগ্রস্ত শিশুটিকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন তিনি স্বীয় আবাস পরিত্যাগ করিয়া সেই কুটীরে রোগীর সেবায় নিযুক্তা রহিলেন। গৃহ পরিশোধিত করা প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং একখানি ক্ষুদ্র মই লইয়া গৃহে চুনকাম করিতে লাগিলেন। রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তাঁহার শুশ্রূষায় শৈথিল্য সঞ্চারিত হইল না। দুইদিন পরে শিশু এই করুণাময়ীর স্নেহ-তপ্ত অঙ্কে অন্তিম নিদ্রায় নিদ্রিত হইল।" শিশুটি মৃত্যুর আগে নিবেদিতাকেই তার জননী মনে করে 'মা মা' বলে ডেকে উঠেছিল।

যুবক দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন ধনীর সন্তান। স্বামীজী তাঁকে নির্দেশ দেন উত্তরাখণ্ডে পীড়িত, রুগ্ন সাধুদের সেবা করতে। গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে কপর্দকহীন সন্ন্যাসী শুধু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে গড়ে তুললেন কনখল সেবাশ্রম। এক গভীর রাতে সেখানে এক রোগী এসে উপস্থিত। বেশিক্ষণ তার আয়ু নেই। ডাক্তারেরা ভর্তি করতে চাইলেন না। হৃদয়বান কল্যাণানন্দ তাকে সুন্দর শয্যায় রেখে শেষ সেবা করেন। তার শেষকৃত্যও করেন। শিষ্যকে গুরু আশীর্বাদ করেছিলেন, 'তুই পরমহংস হবি'। সেই আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি। এইসব দানবীর সর্বভূতে অবস্থিত প্রেমময়কে অন্তরে অনুভব করেছিলেন। বিবেকানন্দের আহ্বানে এরকম কত মহাদানী আবির্ভূত হয়েছেন, আরও কত জন হবেন।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নিজের মধ্যে অনন্ত প্রেমসিন্ধুকে উপলব্ধি করেন। তাঁর দান কোনও কিছুর অপেক্ষায় বর্ষিত হয় না, অযাচিত করুণার আকারে নেমে এসে জীবকে শিবত্বের দিকে নিয়ে চলে। আচার্য শংকর বিবেকচূড়ামণিতে বলেছেন, মহাত্মাদের স্বভাবে পরদুঃখ নিরসনের প্রবণতা স্বতই হয়। যেমন প্রখর সূর্যকিরণে উত্তপ্ত পৃথিবীকে চন্দ্র তাঁর স্নিগ্ধ কিরণে আপনিই রক্ষা করেন (শ্লোক ৩৮)। তুরীয়ানন্দজীকে স্বামীজী বলেছিলেন, তাঁর হৃদয় খুব বড় হয়ে গেছে। ধর্মজগতে যে যত এগিয়ে যান তাঁর হৃদয় তত বেশি প্রসারিত হতে থাকে। স্বত উৎসারিত প্রেমে তিনি সকলের সঙ্গে এক হয়ে যান। পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে মনে করেন।

অহেতুক কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব, জগজ্জননী সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ সর্বশ্রেষ্ঠ দানের পূর্ণ বিগ্রহ। ঈশ্বর ত্রিধা প্রকাশিত হয়ে নরলীলায় এই মহাদানযজ্ঞ উদ্‌যাপন করে গেছেন—এখনও করে চলেছেন। আমরা যেন 'দাও আর ফিরে নাহি চাও' এই মন্ত্র-সাধনের মাধ্যমে সেই মহাদানের যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।